কনডম: একের ভিতরে দুই ৩
কর্মক্ষেত্রে সর্বজনীন সাবধানতা ৪
মরণব্যাধি হেপাটাইটিস বি ৬
বাংলাদেশে সম্ভাব্য এইডস মহামারী ৭
জলবসন্ত ৮

ISSN 1021-2078

স্বাস্থ্য সংলাপ

আইসিডিডিআর,বি: সেন্টার ফর হেলথ এ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ

বর্ষ ১১ সংখ্যা ২ অগ্রহায়ণ ১৪০৯

শিশুদের মাইগ্রেনজনিত মাথা-ব্যথা

মোহাম্মদ ইকবাল

শিশুদের মাথা-ব্যথার কথা শুনলে আঁতকে উঠবেন। ভাববেন, শিশুদের আবার মাথা-ব্যথা কী? আসলে বড়দের মত শিশুদেরও মাথা-ব্যথা হয়। মাথা-ব্যথা ছোটবড় সবারই একটি সাধারণ স্বাস্থ্যসমস্যা। কখনও কখনও মাথা-ব্যথার কারণে শিশু প্রায়ই এত অসুস্থ থাকে যে, তার পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটে ও স্কুলে উপস্থিতির হার কমে যায়। মাথা-ব্যথা নিজে কোনো রোগ নয়। এটা অন্য রোগের উপসর্গ মাত্র।

মাথা-ব্যথার কারণ

নানা কারণে মাথা-ব্যথা হতে পারে। খুবই সাধারণ অসুখে যেমন মাথা-ব্যথা হয়, তেমনি খুবই কঠিন রোগ, যেমন ব্রেইন টিউমারের কারণেও মাথা-ব্যথা হতে পারে। তাই মাথা-ব্যথার কারণগুলো আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন।

সাধারণত যেসব কারণে শিশুদের মাথা-ব্যথা হতে পারে সেগুলো হলো: মাইগ্রেন, বিভিন্ন কারণে জ্বর, মানসিক চাপ/সাইকোজেনিক এবং ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসার (করোটির ভিতরের চাপ) বেড়ে যাওয়ার কারণজনিত মেনিনজাইটিস, এনকেফালাইটিস, হাইড্রোকেফালাস, সেরেব্রাল ম্যালেরিয়া, ব্রেইন টিউমার কিংবা সাইনোসাইটিস, চোখের অসুস্থতা, দাঁতের সমস্যা, ইত্যাদি।

মাইগ্রেন কী

মাইগ্রেন কথাটি এসেছে ফরাসী শব্দ মেগ্রিম থেকে--চলতি কথায় আমরা যাকে 'আধ-কপালি' বলে থাকি। মাইগ্রেন হলো এক ধরনের মাথা-ব্যথা, যা খুব ঘনঘন হয়ে থাকে; সাধারণত কপালের একপাশে হয় এবং অন্য কিছু উপসর্গও সাথে থাকতে পারে, যেমন বমি-বমি ভাব, চোখে কম-দেখা/ঝাপসা-দেখা, শরীরের কোনো অংশে দুর্বল বোধ-করা, ইত্যাদি।

শিশুদের মাইগ্রেন

শিশুদের মাথা-ব্যথার প্রধান কারণ মাইগ্রেন। বড়দের চাইতে শিশুদের মধ্যে মাইগ্রেনের হার বেশি। যেকোনো বয়স থেকে এই রোগ শুরু হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে সাধারণত ৭ বছর থেকে ১৫ বছর বয়সের মধ্যে মাইগ্রেন শুরু হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে সাধারণত কিশোরী বয়স থেকে শুরু হয়; ছেলেদের সাধারণত ১০ বছরের কম বয়স থেকে শুরু হয়। যেসব শিশু মাইগ্রেনে ভোগে তাদের বেশিরভাগ বড় হবার পর সম্পুর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। তবে ছেলেদের ক্ষেত্রে ১০ ভাগ ও মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৫-২০ ভাগ লোক বড় হবার পরও মাইগ্রেনে ভুগে থাকে।

মাইগ্রেনের কারণ

মাইগ্রেনের সঠিক কারণ জানা নেই, তবে বংশানুক্রমিক ধারাকে এই রোগের গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে ধরা হয়। শরীরে হরমোনের পরিবর্তন, খাদ্যে সংবেদনশীলতা, শব্দদূষণ, হৈ-হুল্লোড়, স্কুল অথবা বাড়িতে অতিরিক্ত মানসিক চাপ, ক্ষুধা, অতিরিক্ত পরিশ্রম অথবা ব্যায়াম, মাথায় সামান্য আঘাত, ইত্যাদি মাইগ্রেনের কারণ হতে পারে। সাধারণত যেসব খাদ্যের প্রতি সংবেদনশীলতা মাইগ্রেনের কারণ হতে পারে সেগুলো হচ্ছে বাদাম-চকোলেট, কোলাজাতীয় পানীয়, মসলাযুক্ত মাংস, লবণ-দেয়া শুটকি, টেষ্টিং-সল্ট, চাইনীজ খাবার, ইত্যাদি। তবে এতে ব্যক্তিবিশেষে ভিন্নতা দেখা যায়।

কিছু কিছু উদ্দীপক: যেমন তীব্র আলোর ঝলকানিযুক্ত অনুষ্ঠান, সূর্যের তীব্র আলোতে বেশিক্ষণ থাকা, ইত্যাদি কারণেও মাইগ্রেন হতে পারে। রক্তে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ আছে

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি) উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কলেরাসহ ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ওপর গবেষণা, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে পাক-সিয়াটো কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে ঢাকার মহাখালীতে যে প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, মূলত সে-প্রতিষ্ঠানই ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে তার বর্তমান নাম ধারণ করে। এ-প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও সেবাদান-সংক্রান্ত কর্মপরিধি এখন আর কেবল ডায়রিয়াজাতীয় রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশু-স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, পুষ্টিবিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি ও টিকাবিষয়ক বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনাবিষয়ক কর্মকাঠামোও আইসিডিডিআর,বি'র গবেষণা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডায়রিয়া রোগীর জীবন রক্ষাকারী খাবার স্যালাইনের আবিষ্কার ও উন্নত মানের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আইসিডিডিআর,বি পৃথিবী বিখ্যাত।

স্বাস্থ্য সংলাপ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা	ডেভিড এ. স্যাক
প্রধান সম্পাদক	ফকির আঞ্জুমান আরা
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক	এম. শামসুল ইসলাম খান
সম্পাদক	এম.এ. রহীম
সদস্য	ইউসুফ হাসান হাফিজুর রহমান চৌধুরী হাসান আশরাফ সিরাজুল ইসলাম তামান্না শারমীন মাসুমা আক্তার খানম
মাস্ট হেড ডিজাইন	আসেম আনসারী
ডেস্কটপ প্রসেসিং ও প্রকাশনা	তালুত সোলায়মান
কম্পোজ	হামিদা আক্তার

প্রকাশক
আইসিডিডিআর,বি: সেন্টার ফর হেলথ এ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ
মহাখালী, ঢাকা ১২১২ (জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০)
বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০২) ৮৮২ ২৪৬৭, ৮৮১ ১৭৫১-৬০
ফ্যাক্স: (৮৮০২) ৮৮২ ৩১১৬ ও ৮৮২ ৬০৫০
ইমেইল: msik@icddrb.org

মুদ্রণ
সেবা প্রিন্টিং প্রেস
সি বি ১১০, মহাখালী রেলগেট
ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ

যেগুলোর পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার কারণে মস্তিষ্কের রক্তনালীগুলো সংকুচিত এবং পরে প্রসারিত হয়। রক্তনালীগুলো সংকোচনের কারণে মস্তিষ্কের রক্ত সরবরাহ কমে যায় এবং এই সময় স্নায়বিক কিছু লক্ষণ অনুভূত হয়: যেমন চোখে ঝাপসা-দেখা, কথা বলতে অসুবিধা-হওয়া, শরীরের কোনো অংশে দুর্বল বোধ-করা, ইত্যাদি। এরপর সংকুচিত নালীগুলো প্রসারিত হওয়ার পর প্রচণ্ড মাথা-ব্যথা শুরু হয়।

শ্রেণী বিভাগ

মাইগ্রেন বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে: যেমন সাধারণ মাইগ্রেন, ক্লাসিক্যাল মাইগ্রেন, মাইগ্রেন ভ্যারিয়েন্টস, ক্লাস্টার মাইগ্রেন এবং জটিল মাইগ্রেন। এগুলোর মধ্যে ক্লাস্টার মাইগ্রেন শিশুদের খুবই কম হয়ে থাকে।

সাধারণ মাইগ্রেন

শিশুদের ক্ষেত্রে এধরনের মাইগ্রেন সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে। মাথা-ব্যথা ১-৩ ঘণ্টা পর্যন্ত, এমনকি ২৪ ঘন্টা পর্যন্তও থাকতে পারে। বমি-বমি ভাব হতে পারে। কারো কারো বেলায় পেটে ব্যথাও হতে পারে। এ-সময় বাচ্চাকে ফ্যাকাশে বা নিস্প্রভ মনে হয়। আলো অসহ্য লাগতে পারে; মাথা হালকা লাগে, বেশি শব্দ ভালো লাগে না। কারো কারো কাছে হাত ও পা কিছুটা অবশ মনে হয়। এধরনের মাইগ্রেন ৯০ ভাগই পারিবারিক সূত্রে পাওয়া এবং তা মায়ের দিক থেকেই বেশি সঞ্চারিত হয়।

ক্লাসিক্যাল মাইগ্রেন

এধরনের মাইগ্রেনে মাথা-ব্যথা শুরু হবার আগে কিছু কিছু লক্ষণ অনুভূত হয়: যেমন দৃষ্টি আবছা হয়ে-যাওয়া, অদ্ভুত আলোর ফুটকি বা বিস্ফারিত আলো-দেখা, একটা হাত বা পা অসাড় অনুভূত হওয়া, ইত্যাদি। এরপর প্রচণ্ড মাথা-ব্যথা শুরু হয়, যা কয়েক ঘণ্টা থেকে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত থাকতে পারে।

মাইগ্রেন ভ্যারিয়েন্টস

পর্যায়ক্রমিক বমি ও মাথা-ব্যথা এধরনের মাইগ্রেনের বৈশিষ্ট্য। পর্যায়ক্রমিক বমি সাধারণত ছোট শিশুদের বেলায় হয়ে থাকে। প্রতিমাসে মাথা-ব্যথার আক্রমণ হতে পারে। পর্যায়ক্রমিক বমির সাথে পেট-ব্যথা ও জ্বর থাকতে পারে। প্রচুর বমি করার ফলে জলশূন্যতা দেখা দেয়। কয়েকদিন বমি করার পর শিশু ক্লান্ত হয়ে পড়ে। দীর্ঘ ঘুমের পর সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করে।

জটিল মাইগ্রেন

মাইগ্রেনে মাথা-ধরার সাথে কিছু স্নায়বিক লক্ষণ থাকে, এমনকি মাথা-ধরা সেরে যাবার পরও কিছুদিন পর্যন্ত এ-লক্ষণগুলো থাকতে পারে। মাথা-ধরা ছাড়াও মাথা-ঘোরা, কর্ণনাদ, চোখে ঝাপসা-দেখা, মাথা-ব্যথা, কথা বলতে কষ্ট-হওয়া, শরীরের একপাশ অসাড়-হওয়া, ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়।

রোগ নির্ণয়

মাইগ্রেন নির্ণয়ের জন্য সাধারণত কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। রোগের ইতিহাস ও শারীরিক পরীক্ষার মাধ্যমেই রোগ নির্ণয় করা যায়। তবে ব্রেইন টিউমার সন্দেহ হলে নিচের পরীক্ষাগুলো দ্রুত করিয়ে নেওয়া প্রয়োজন:

- করোটির এক্সরে
- সিটি স্ক্যান
- এমআরআই

সাধারণ ব্যবস্থাপনা

মাইগ্রেনের তেমন সুনির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই। উচ্চনাদের শব্দ, তীব্র আলো, আলোর ঝলকানি, সূর্যের কিরণে দীর্ঘক্ষণ থাকা, বায়ুদূষণ এবং হৈ-হুল্লোড় এড়িয়ে চলতে হবে। বাড়ি ও স্কুলে শিশুকে পড়ার জন্য অতিরিক্ত মানসিক চাপ দেওয়া যাবে না। প্রয়োজনে অধিক প্রতিযোগিতামুলক স্কুল থেকে এনে শিশুকে সাধারণ স্কুলে ভর্তি করাতে হবে। পারিবারিক কলহ যাতে শিশুদের মনে কোনো রেখাপাত করতে না পারে সেজন্য বাবা-মা ও অন্যান্যদের সতর্ক থাকতে হবে। শিশুর কোনো খাদ্যে সংবেদনশীলতা আছে কি না তা চিহ্নিত করতে হবে এবং বিশেষ খাদ্য পরিহার করতে হবে। নির্ধারিত রুটিনমাফিক শিশুকে খাবার দিতে হবে, যাতে সে ক্ষুধায় কষ্ট না পায়। পরিশ্রম ও ব্যায়ামের মাত্রা সীমিত রাখতে হবে। শিশুদের প্রতি বাবা-মা ও বড়দের আচরণ সহানুভূতিশীল এবং বন্ধুত্বপূর্ণ হতে হবে। সাধারণ ব্যবস্থাপনায় শতকরা ৫০ ভাগ শিশু সুস্থ হয়ে যায়।

মাইগ্রেনজনিত মাথা-ব্যথার আক্রমণের ব্যবস্থাপনা

নিরিবিলি, আরামদায়ক, অন্ধকারাচ্ছন্ন, শব্দহীন কক্ষে শিশুকে দীর্ঘক্ষণ বিশ্রামে রাখতে হবে। এই পরিবেশে ৮-১০ ঘণ্টা বিরামহীন ঘুমের পর শিশু সুস্থ বোধ করে।

শিশুদের মাইগ্রেনের জন্য দুই ধরনের কার্যকর ওষুধের প্রয়োজন: যেমন ব্যথানাশক ও বমননাশক।

ব্যথানাশক

শিশুদের মাইগ্রেনের ব্যথা কমানোর জন্য অনেকগুলো ওষুধ ব্যবহার করা যায়। এগুলো হলো প্যারাসিটামল, এসপিরিন, আইবুপ্রুফেন, ন্যাপ্রোক্সেন কেটোরোলাক, ইত্যাদি। তবে মাইগ্রেন চিকিৎসায় সবচাইতে যৌক্তিক ব্যথানাশক ওষুধ হলো প্যারাসিটামল। একটু বড় বাচ্চা ও কিশোরদের তীব্র ও ক্লাসিক্যাল মাইগ্রেনের লক্ষণ দেখা দেওয়ার শুরুতেই আরগোটামিন গ্রুপের ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। লক্ষণ দেখা দেওয়ার শুরুতেই না দিতে পারলে এ-ওষুধ কোনো কাজ করে না। সাধারণত ১ মি.গ্রা. করে প্রতি ৩০ মিনিট অন্তর এই ওষুধ দেওয়া হয়। জটিল মাইগ্রেন, অসাড় হয়ে-যাওয়া লক্ষণযুক্ত মাইগ্রেনে আরগোটামিন দেওয়া নিষিদ্ধ।

ক্লোরপ্রোমাজিন মুখে, শিরায় এবং পায়খানার রাস্তায় ব্যবহার করে মাইগ্রেনের তীব্র যন্ত্রণা দূর করা যায়। এছাড়া, প্রোক্লোরপ্যারাজিন (স্টিমিটিল) মাইগ্রেনের চিকিৎসায় বহুল-প্রচলিত ওষুধ।

বমননাশক

ডাইমেন হাইড্রিনেট ব্যবহার করে মাইগ্রেনের বমি বন্ধ করা সম্ভব। এছাড়া, ক্লোরপ্রোমাজিন, প্রোমিথাজিন, প্রোক্লোরপ্যারাজিন বমি বন্ধে সাহায্য করে থাকে। পর্যায়ক্রমিক বমির লক্ষণযুক্ত মাইগ্রেনে শিশুদের পানিস্বল্পতা দূর করার জন্য শিরাপথে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্যালাইনজাতীয় তরল সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়ে থাকে।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

যেসব শিশু-কিশোরের ক্ষেত্রে সাধারণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাইগ্রেন প্রতিরোধ করা যায় না এবং যাদের মাইগ্রেনের ব্যথা খুবই ঘনঘন ও তীব্র ধরনের হয়, তাদের প্রতিরোধমূলক ওষুধ দেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিটাব্লকার: যেমন প্রোপানোলল, এটিনোলল, ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া, আরো কিছু ওষুধ: যেমন ফ্লুনারিজিন, ভেরাপামিল, এমিট্রিপটালিন ব্যবহৃত হয়। ১০ বছরের বেশি বয়সের শিশু-কিশোরদের পিজোটাইলিন দেওয়া যেতে পারে। প্রতিরোধমূলক ওষুধ সাধারণত এক-নাগাড়ে ১ বছর ব্যবহার করা হয়।

উন্নত বিশ্বে মাইগ্রেনের চিকিৎসার জন্য মাইগ্রেন সেন্টার আছে। সেখানে ওষুধ ছাড়াও আত্মসম্মোহন, বায়োফিডব্যাক, ইত্যাদির মাধ্যমে মাইগ্রেনের চিকিসা করা হয়।

জেনে রাখা ভালো জেনে রাখা ভালো জেনে রাখা ভালো জেনে

জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও যৌনরোগ প্রতিরোধে কনডম

একের ভিতরে দুই

মোঃ মেহরাব আলী খান

আধুনিক পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে কনডম অন্যতম, যা পুরুষদের ব্যবহারোপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে। কনডম ব্যবহার সহজ ও নিরাপদ। সঠিকভাবে কনডম ব্যবহার করতে পারলে এর কার্যকারিতা নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। বিগত বছরগুলোর পরিসংখ্যান নিলে দেখা যায়, কনডম ব্যবহার অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় অনেক কম এবং এর ব্যবহারকারীর হার বৃদ্ধি পাওয়ার কোনো লক্ষণও দেখা যায় না। বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায়, কনডম ব্যবহারে ঝামেলাই এর কম জনপ্রিয়তার একমাত্র ও প্রধান কারণ, যদিও কিছু কিছু ব্যবহারকারী বলেছেন, কনডম ব্যবহার করলে যৌনমিলনে তৃপ্তি পাওয়া যায় না বলে ব্যবহারকারীরা অনীহা প্রকাশ করেন। প্রত্যেক পদ্ধতিরই কিছু না কিছু খারাপ, আবার কিছু কিছু ভালো দিকও আছে। কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করার আগে এর গুণাগুণ জেনে ব্যবহার করা উচিত। সাম্প্রতিক কালের গবেষণা থেকে জানা যায় যে, অন্যান্য পদ্ধতির মত কনডম-এর কোনো পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নেই। তবুও বাংলাদেশে কনডম-এর ব্যবহার বিগত বছরগুলোতে প্রায় একই রকম রয়ে গেছে। বর্তমানে বিভিন্ন কারণে সারাবিশ্বে পুরুষ ও মহিলাদের অবাধ যৌনমিলনের ফলে এইচআইভি/এইডসসহ বিভিন্ন যৌনরোগ বিস্তার লাভ করছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও যৌনরোগ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কনডম ব্যবহারে অনিয়ন্ত্রিত বা অবাধ যৌনক্রিয়ার দ্বারা যৌনরোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। তাই জনসংখ্যা হ্রাসের জন্য কনডম ব্যবহার বৃদ্ধি করে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের হার বাড়ানো যায়। অন্যদিকে যৌনরোগ প্রতিরোধের জন্য আমাদের প্রত্যেকের উচিত কনডম ব্যবহারের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে কনডম ব্যবহারের হার বাড়ানো। কেননা কনডম একদিকে যেমন জন্ম নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, অন্যদিকে এর ব্যবহার যৌনরোগ প্রতিরোধ করতেও সাহায্য করে। 'একের ভিতরে দুই' কথাটি এ-কারণে কনডম-এর বেলায় প্রযোজ্য।

সক্ষম দম্পতিদের ক্ষেত্রে জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহার একান্ত অপরিহার্য। কোনো কোনো আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে বিভিন্ন পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। তাই কখনও কখনও মহিলারা এগুলো ব্যবহার করতে গিয়ে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। যেসব মহিলা কোনো আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করার ফলে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার কারণে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হন বা পদ্ধতি চালিয়ে যেতে অসমর্থ হন, তাদের স্বামীদের এগিয়ে এসে কনডম ব্যবহারের দ্বারা পরিবারকে সীমিত রাখতে সাহায্য করা উচিত। ক্ষেত্রবিশেষে কোনো কোনো পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের সঙ্গে কনডমও ব্যবহার করা উচিত বলে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন।

কনডম পুরুষদের ব্যবহারের জন্য। মহিলাদের ব্যবহারের জন্যও নতুন ধরনের কনডম অচিরেই বাজারজাত করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। যেসব পুরুষ বা মহিলা একাধিক মহিলা বা পুরুষের সঙ্গে অবাধ যৌনকাজে লিপ্ত হন, তাদের জন্য কনডম ব্যবহার অত্যন্ত জরুরী। বর্তমানে অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যৌনরোগ আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর কারণগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে পুরুষ ও মহিলাদের অবাধ বা অনিয়ন্ত্রিত যৌনক্রিয়ার বর্ধিত মাত্রা। সঠিকভাবে কনডম ব্যবহার করতে পারলে কিংবা যেসব পুরুষ বা মহিলা উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন করে, তারা কনডম ব্যবহার করলে তা যৌনরোগ প্রতিরোধে সহায়ক হবে--অনেক অভিজ্ঞ লোক বা নীতি-নির্ধারকগণ এমন ধারণা পোষণ করেন। তাই কনডম ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

অন্যান্য আধুনিক পদ্ধতি (যেমন: বড়ি, ইনজেকশন বা আইইউডি) ব্যবহারে বিভিন্ন রকম পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া থাকায় এগুলোর যথার্থ কার্যকারিতা হচ্ছে না বলে অনেকে মনে করেন। যদি দেখা যায় কোনো পদ্ধতি সক্ষম দম্পতিদের জন্য বিভিন্ন পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার কারণে মানানসই নয়, তখন কনডম ব্যবহার করে পরিবার সীমিত রাখা যেতে পারে। এতে একদিকে যেমন স্ত্রীদের স্বাস্থ্যের প্রতি পুরুষদের লক্ষ রাখার দায়িত্বটি পালন করা হবে, অন্যদিকে জাতিকে জনসংখ্যার ক্রম-বর্ধমান চাপ থেকে রক্ষা করা ও দেশকে মারাত্মক ব্যাধি এইচআইভি/এইডস তথা সব ধরনের যৌনরোগ থেকে মুক্ত রাখা সম্ভব হবে। এ-ব্যাপারে প্রতিটি পরিবারের, বিশেষ করে পুরুষদের, সচেতন হতে হবে ও কনডম ব্যবহারের ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে।

যেসব পুরুষ বা মহিলা অবাধে অন্য মহিলা বা পুরুষদের সঙ্গে যৌনক্রিয়ায় মিলিত হন, সেসব ঝুঁকিপূর্ণ পুরুষ বা মহিলাদের ক্ষেত্রে অন্য পদ্ধতি ব্যবহারের সঙ্গে কনডম ব্যবহার করাও জরুরী হয়ে পড়েছে। কেননা ঝুঁকিপূর্ণ মহিলা বা পুরুষদের যদি কোনো কারণে অন্য কোনো পুরুষ বা মহিলাদের সঙ্গে যৌনক্রিয়ায় মিলিত হওয়ার ফলে যৌনরোগে আক্রান্ত হন, তবে তা তার বিবাহিত জীবনেও প্রভাব ফেলতে পারে অর্থাৎ বিবাহিত পুরুষ বা মহিলারা আক্রান্ত হতে পারেন। ফলে স্ত্রী বা স্বামীর যেমন এ-রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তেমনি আক্রান্ত মহিলা যদি গর্ভবতী হন তবে তার গর্ভের বা গর্ভজাত শিশুটিও একইভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে অর্থাৎ যৌনরোগে আক্রান্ত হতে পারে। এজন্য কখনও কখনও বড়ি বা ইনজেকশন গ্রহণকারীদেরও কনডম ব্যবহার করা জরুরী, কেননা বড়ি বা ইনজেকশন জন্ম নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করলেও যৌনরোগ প্রতিরোধ করতে পারে না।

বিভিন্ন গবেষণা থেকে আরো জানা যায়, অনেক কনডম ব্যবহারকারী সঠিকভাবে তা করেন না, অর্থাৎ যেভাবে কনডম ব্যবহার করলে কার্যকর হবে সেভাবে তারা করছেন না। ফলে এর ব্যবহার অকার্যকর হতে দেখা যায়। এতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ তো হচ্ছেই না, এমনকি যৌনরোগও প্রতিরোধ সম্ভব হচ্ছে না। কনডম ব্যবহারে যে ঝামেলা বা সমস্যা আছে তা থেকে এর যে গুণ আছে তা একটু ভালোভাবে বিবেচনা করলে এর ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। তাই কনডমের সঠিক ব্যবহার জেনে কনডম ব্যবহার করলে জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও যৌনরোগ প্রতিরোধ ১০০ ভাগ কার্যকর হবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

রক্তবাহিত সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ
কর্মক্ষেত্রে সর্বজনীন সাবধানতা

এ কে এম মাহমুদুর রহমান

অসুস্থতার চিকিৎসার জন্যে লোকজন যেসব স্থানে যাতায়াত করে: যেমন ক্লিনিক, ল্যাবরেটরি বা হাসপাতাল, সেসব স্থানে একজনের দেহ থেকে আরেকজনের দেহে সংক্রামক রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা সব সময়ই থাকে। যে তিন প্রক্রিয়ায় এই সংক্রমণ ঘটতে পারে তা হলো:

১. এক রোগীর দেহ থেকে অন্য রোগীর দেহে
২. কোনো রোগীর দেহ থেকে কোনো স্বাস্থ্যকর্মীর দেহে
৩. কোনো স্বাস্থ্যকর্মীর দেহ থেকে কোনো রোগীর দেহে

এধরনের সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্যে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন অপরিসীম। সেই সাথে সুস্থ পরিবেশ রক্ষা করাও একান্ত জরুরী।

সর্বজনীন সাবধানতা

সর্বজনীন সাবধানতার উদ্দেশ্য হলো কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে রক্তবাহিত রোগ থেকে রক্ষা করা। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার আগে জানা প্রয়োজন কী কী রোগ রক্তের মাধ্যমে একজনের দেহ থেকে আরেকজনের দেহে ছড়াতে পারে। যেসব রোগ-জীবাণু রক্তের মাধ্যমে ছড়ায় তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো: ১. হেপাটাইটিস বি ও সি ভাইরাস, ২. হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (এইচআইভি), ৩. সাইটোমেগালো ভাইরাস, ৪. ম্যালেরিয়ার জীবাণু এবং ৫. সিফিলিসের জীবাণু।

এসবের মধ্যে হেপাটাইটিস বি ও হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এদের ছড়ানোর পদ্ধতিও একই রকমের, যদিও রক্তে বেশি পরিমাণে থাকার কারণে এবং দেহের বাইরে বেশি সময় বেঁচে থাকতে পারে বলে সংক্রমণের জন্য হেপাটাইটিস বি অধিক কার্যক্ষম।

যদিও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উপস্থিতির কারণে এইচআইভি একজন থেকে অন্যজনের মধ্যে ছড়ানোর সম্ভাবনা কম, তবুও এই জীবাণু সংক্রমণের মারাত্মক পরিণতির জন্য অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বনের গুরুত্ব অনেক। এ-ভাইরাস একবার কারো শরীরে প্রবেশ করলে তার মৃত্যু প্রায় অনিবার্য। রক্ত ছাড়াও অন্যান্য দৈহিক নির্যাসে এইচআইভি থাকতে পারে।

বিভিন্ন টিস্যু বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কিংবা দৈহিক নিঃসরণ যেমন: বীর্য, স্ত্রী-যৌনাঙ্গের রস, বুকের দুধ, নাকের নিঃসরণ, লালা, ফুসফুসের আবরণীর মধ্যকার পানি, মস্তিষ্কের ভিতরকার পানি, চোখের পানি ও মলে এইচআইভি থাকতে পারে।

এ-কথা মনে রাখা দরকার যে, যদিও এসব দৈহিক নির্যাসের মধ্যে এইচআইভি থাকতে পারে, তবুও যতক্ষণ পর্যন্ত না এসবের মধ্যে খালি চোখে রক্ত দেখা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত এদেরকে সংক্রমণের জন্য সাধারণত দায়ী করা হয় না। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রক্তই এ-রোগ ছড়ানোর জন্য সবচাইতে কার্যকর মাধ্যম।

সংক্রমণের পদ্ধতি

কর্মক্ষেত্রে হেপাটাইটিস বি এবং এইচআইভি সূঁচের আঘাত, চামড়ার ক্ষত, ঝিল্লি, নাক, চোখ, মুখ ও শ্বাসনালীর মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করতে পারে। এসবের মধ্যে সূঁচের আঘাতকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা হয়।

রক্তবাহিত রোগের প্রতিরোধ

কর্মক্ষেত্রে সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার এবং প্রতিরোধের ব্যাপারে চাকুরিদাতা ও কর্মচারী উভয়েরই দায়িত্ব আছে। যেসব উপায়ে কর্মক্ষেত্রে রোগীদের দেহ থেকে স্বাস্থ্যকর্মীর

অসাবধান হলে রোগীকে ইনজেকশন দিতে গিয়ে সূঁচের আঘাতে একজন স্বাস্থ্যকর্মী নিজেই মারাত্মক রক্তবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারেন

দেহে সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যায় তার মধ্যে আছে:

১. হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের প্রতিরোধক টিকা
২. সর্বজনীন সাবধানতা অবলম্বন
৩. এইচআইভি প্রতিরোধের সাধারণ ব্যবস্থা গ্রহণ
৪. ধারালো বস্তু ও সংক্রামিত দ্রব্যাদি নিরাপদভাবে পরিত্যাগ করা অর্থাৎ নিরাপদ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা

বর্তমানে এইচআইভি প্রতিরোধের জন্য কোনো কার্যকর টিকা নেই, কিন্তু হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের প্রতিরোধের জন্য কার্যকর টিকা আছে। এজন্যে চাকুরিদাতার কর্তব্য যেসব কর্মচারীর মধ্যে সংক্রমণের সম্ভাবনা আছে, তাদের টিকা দেবার ব্যবস্থা করা এবং কর্মচারীদের উচিৎ তা গ্রহণ করা।

সর্বজনীন সাবধানতা কী?

সংক্রমণ বিস্তারের বিরুদ্ধে সর্বজনীন সাবধানতা এমন এক প্রতিরোধ ব্যবস্থা, যা এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত যে, প্রতিটি রোগী এবং তাদের দৈহিক নির্যাস বা টিস্যু রক্তবাহিত রোগ ছড়াতে সক্ষম। অন্য কথায়, সর্বজনীন সাবধানতার সংজ্ঞা হলো: এটা এমন এক প্রতিরোধ ব্যবস্থা, যা রোগীর যেকোনো দৈহিক নির্যাসের সরাসরি সংস্পর্শে আসাকে রোগ সংক্রমণে কার্যকর মনে করে। প্রতিটি রোগীর জন্য রক্তবাহিত সকল রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব নয় এবং তা করলেও রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থাসমূহ প্রতিটি সংক্রামিত রোগীকে সনাক্ত করতে সক্ষম নয়।

আড়াআড়ি সংক্রমণ প্রতিরোধ ও সর্বজনীন সাবধানতা

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসার কারণে লোকজনের মধ্যে যে সংক্রমণের বিস্তার ঘটে তাকে 'আড়াআড়ি সংক্রমণ' বলে। আড়াআড়ি সংক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্য হলো স্বাস্থ্যসেবা পেতে-আসা লোকজনের মধ্যে সংক্রমণ প্রতিরোধ। অপরপক্ষে, সর্বজনীন সাবধানতার মূল উদ্দেশ্য হলো সংক্রমণ থেকে স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপদ রাখা।

কার্যকর সর্বজনীন সাবধানতা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত কার্যধারা ও নির্দেশনা প্রণয়ন, কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, এবং এ-ব্যবস্থা কার্যকর হচ্ছে কি না তা যাচাই করা। অন্যদিকে, কর্মীদের কর্তব্য হলো এ-ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা, এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা, ব্যবস্থা না-মানার ফলাফল সম্পর্কে জানা এবং সর্বোপরি এ-ব্যাপারে সকল নির্দেশমালা মেনে-চলা। এছাড়া, কর্মীদের উচিত এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধে সাধারণ নিয়মাবলি ও পরিবেশের স্বাস্থ্য বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলো মেনে-চলা। রক্তবাহিত রোগ প্রতিরোধে সর্বজনীন সাবধানতার জন্য যা যা মেনে-চলা খুবই জরুরী তা হলো:

- হাত-ধোওয়া
- ধারালো বস্তু ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করা
- সংক্রমণের প্রতিবন্ধক ব্যবহার করা

উপরের ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে হাত-ধোওয়া সবচেয়ে সহজ, সস্তা ও নিরাপদ। রোগীর সংস্পর্শে আসার পর, রোগীর দৈহিক নিঃসরণের সংস্পর্শে আসার পর, দস্তানা খোলার পর ও কর্মক্ষেত্র ত্যাগের আগে ভালো করে হাত ধোওয়া প্রত্যেক স্বাস্থ্যকর্মীর জন্য খুবই জরুরী।

ধারালো বস্তুর আঘাত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এইচআইভি সংক্রমণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ধারালো বস্তুর আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব:

১. প্রয়োজন ছাড়া ধারালো বস্তু ব্যবহার না-করা এবং এসবের ব্যবহার যতদুর সম্ভব কমানো
২. সূঁচের ঢাকনি পুনরায় না-লাগানো
৩. সূঁচ বাঁকানো বা ভাঙার চেষ্টা না-করা
৪. সিরিঞ্জ থেকে সূঁচ আলাদা করার চেষ্টা না-করা
৫. একান্ত প্রয়োজনে এক হাতে সূঁচের ঢাকনি লাগানো
৬. ঢাকনিযুক্ত, ছিদ্র-প্রতিরোধী পাত্রে ব্যবহৃত ধারালো দ্রব্যাদি ফেলা
৭. সূঁচের পুনগণনা না-করা

রক্ত ও অন্যান্য দৈহিক নিঃসরণ এবং সংক্রামিত যন্ত্রপাতির সংস্পর্শ থেকে বাঁচার জন্য প্রতিবন্ধক ব্যবস্থা: যেমন দস্তানা, মুখোশ ও গাউন ব্যবহার করা হয়। ল্যাবরেটরির জন্য পরীক্ষাসামগ্রী সংগ্রহের সময় এবং তা নাড়াচাড়া করার সময়, অপারেশনের সময় এবং জরুরী কাজে দস্তানা ও গাউন পরা প্রয়োজন। কাজ শেষে দস্তানা ও গাউন খোলার পর ভালোভাবে হাত ধুয়ে ফেলতে হবে। ফিনকি-দিয়ে রক্তপাত হলে তা বন্ধের সময় এবং জরুরী ধাত্রীকাজে চোখে চশমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া, কোথাও রোগীর দৈহিক নিঃসরণ পড়লে তা জীবাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা নিতে হবে। কর্মরত অবস্থায় ধুমপান, পানাহার ও প্রসাধনী লাগানো সকল স্বাস্থ্যকর্মীকে এড়িয়ে চলতে হবে।

বর্জ্য-পদার্থের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা

বর্জ্য-পদার্থের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা শুধুমাত্র স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্যে নয়, অন্যত্র সুস্থ পরিবেশ রক্ষার জন্যও জরুরী। কঠিন দ্রব্যাদি জীবাণুমুক্ত করে, ধুয়ে, পুড়িয়ে ফেলতে হবে। সংক্রামিত দ্রব্যাদি যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কোথাও সংক্রামিত তরল দ্রব্যাদি পড়লে তার ছড়ানো প্রতিরোধ করতে হবে এবং তোয়ালে দিয়ে শুষে নিয়ে তোয়ালেকে ও স্থানকে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। স্বাস্থ্যকর্মীদের জানতে হবে: কোন কোন যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করা প্রয়োজন এবং তা কিভাবে এবং কখন কখন করতে হবে। যেসব যন্ত্রপাতি রোগীর শরীরের জীবাণুযুক্ত অংশে/অঙ্গে (রক্তনালী, মূত্রথলি, মাংসপেশী, ইত্যাদিতে) প্রবেশ করে অথবা ঝিল্লি স্পর্শ করে (মুখ, গহ্বর, শ্বাসনালী, ইত্যাদি), সেগুলো যত্ন সহকারে জীবাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে। যতবার এরকম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়, ততবারই এ-কাজগুলো করতে হবে।

যন্ত্রপাতির নির্বীজকরণ ও নির্দোষকরণ

যন্ত্রপাতির নির্দোষকরণ ও নির্বীজকরণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে স্বাস্থ্যকর্মীদের উপযুক্ত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অটোক্লেভের মাধ্যমে ১২১° সেঃ গ্রেঃ তাপমাত্রায় ৩০ মিনিট, ৭০% রেকটিফায়েড স্পিরিটের মাধ্যমে বা ১% সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট বা ১ লিটার পানিতে ২.৫ চা-চামচ ব্লিচিং পাউডারের দ্রবণে যন্ত্রপাতি নির্দোষকরণ করা যায়। ব্লিচিং পাউডার ব্যবহারের সময় মনে রাখতে হবে যে, তা যেন পাউডার অবস্থায় থাকে এবং তীব্র ঝাঁঝালো হয়; জমাট-বাঁধা ব্লিচিং পাউডার এ-কাজের উপযুক্ত নয়। সাধারণভাবে সর্বত্র ব্যবহৃত হলেও স্বাস্থ্যকর্মীদের মনে রাখা দরকার যে, ডেটল বা স্যাভলন নির্দোষকরণের জন্যে উপযুক্ত নয়।

পরিবেশের স্বাস্থ্য রক্ষা

পরিবেশের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখা স্বাস্থ্যকর্মীদের একান্ত প্রয়োজন। পরিবেশ দুষিত হয় এমন কাজ থেকে সবাইকে বিরত থাকতে হবে। টিউব/নলজাতীয় দ্রব্যাদি সৎকারের আগে 'জৈব-বিপদ' ব্যাগে সংগ্রহ ক'রে তা নির্বীজকরণ (অটোক্লেভ) করতে হবে, শক্ত দ্রব্যাদি পুড়িয়ে ফেলতে হবে, এবং তরল পদার্থ নির্বীজকরণ করে তা ড্রেনে ফেলতে হবে।

সর্বোপরি মনে রাখতে হবে যে, সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি ও সর্বজনীন সাবধানতা অবলম্বনের মাধ্যমে এইচআইভি'র মতো মারাত্মক জীবাণু থেকে নিরাপদ থাকা সম্ভব। সেই সাথে এ-ও মনে রাখতে হবে যে, রোগীকে স্পর্শ-করা বা ভাইরাস-আক্রান্ত লোকের সাথে একই কক্ষে অবস্থান বা করমর্দন বা আলিঙ্গন করার মাধ্যমে এই রোগ-জীবাণু একজন থেকে আরেকজনের মধ্যে ছড়ায় না। তাই এধরনের রোগীর সেবা করার ক্ষেত্রে কোনো অহেতুক ভীতিকে প্রশ্রয় না দিয়ে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সর্বজনীন স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে-চলা। এ-ব্যাপারে প্রবীণদের এগিয়ে আসা দরকার, যাতে নবীনদের অহেতুক ভয় কেটে যায়; তাদের উচিত কাজের মাধ্যমে নবীনদের উৎসাহিত করা।

মরণব্যাধি হেপাটাইটিস বি

এস এম রফিকুল ইসলাম

হেপাটাইটিস বি হলো যকৃতের (লিভারের) প্রদাহ, যা একই নামের এক প্রকার ভাইরাস দ্বারা হয়ে থাকে। যেহেতু এই ভাইরাস কেবল শরীরের সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ একটি অঙ্গ যকৃত বা লিভারকেই আক্রান্ত করে থাকে, তাই লিভারের সকল শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রম বন্ধ হতে থাকে। ফলে ধীরে ধীরে দীর্ঘমেয়াদী লিভারের প্রদাহ সৃষ্টি হয় বা লিভার একেবারেই অকেজো হযে পড়ে কিংবা লিভার সিরোসিস এমনকি লিভার ক্যান্সার হয়ে রোগীর মৃত্যু ঘটে।

বিশ্বব্যাপী হেপাটাইটিস বি-এর ব্যাপকতা

পৃথিবীর শতকরা প্রায় ত্রিশভাগ অর্থাৎ ১.৮ বিলিয়ন লোকের রক্তে হেপাটাটইটিস বি ভাইরাসের উপস্থিতি সনাক্ত হয়েছে। এদের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিনশত মিলিয়ন লোক দীর্ঘমেয়াদী লিভারের প্রদাহে ভুগছে এবং প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক প্রতিবছর লিভার সিরোসিস ও লিভার ক্যান্সারে মারা যাচ্ছে (সুত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০১)

কিভাবে এ-রোগের বিস্তার ঘটে

যেসব মানুষ এ-রোগের ভাইরাস বয়ে বেড়ায় তারা যখন তাদের রক্ত বা শরীরনি:সৃত রস সুস্থ ব্যক্তিদের শরীরে সঞ্চারিত করে তখন শেষোক্তজনেরা আক্রান্ত হয়

- আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে যৌনসঙ্গম কালে
- আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত ইনজেকশনের সূঁচ সুস্থ ব্যক্তি ব্যবহার করলে
- আক্রান্ত মায়ের সন্তান সংক্রামিত হতে পারে

ঝুকিপূর্ণ জনগোষ্ঠি

- বহুগামী অনিরাপদ যৌনসম্ভোগকারী এবং কোনো যৌনরোগে ভুগছে এমন ব্যক্তি
- সমকামীগণ
- ইনজেকশনের মাধ্যমে নিয়মিত নেশাজাতীয় ঔষধ গ্রহণকারী
- আক্রান্ত ব্যক্তির একান্ত সংশ্রবে আছে এমন ব্যক্তি
- আক্রান্ত মায়ের সন্তানেরা
- স্বাস্থ্যকর্মী এবং সেবাদানকারী, বিশেষ করে ধারালো সুক্ষ্ম যন্ত্রপাতি এবং আক্রান্ত রোগীর রক্তের সংস্পর্শে আসে এমন স্বাস্থ্যকর্মী
- হেমোডায়ালাইসিস করাচ্ছে এমন ব্যক্তি

বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এ-রোগ ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। অশিক্ষা তথা যৌনতা বিষয়ে জ্ঞানহীনতা এবং মাদকাসক্তি এই অপরিণাম-দর্শিতার দিকে অনেককে ঠেলে দিচ্ছে। বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিলের ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত একটি বুলেটিনে এ-বিষয়ে কিছু তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

উপরোক্ত রিপোর্টে প্রকাশিত গবেষণা কর্মটি চালিয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ--যেখানে ঢাকার ১৬৪ জন যৌনকর্মীর মধ্যে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে যে, তাদের মধ্যে ১২৯ জনই বর্তমানে এ-রোগের জীবাণু বহন করছে কিংবা কোনো একসময়ে বহন করেছে।

সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মানের একটি সম্মেলনে এসোসিয়েশন ফর দি স্টাডি অব দি লিভার- এর পঞ্চম দ্বিবার্ষিক সভার সভাপতি তাঁর নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন: অন্তত এক কোটি লোক এই মরণব্যাধির ভাইরাস বহন করছে। এছাড়া, প্রতিবছর দেশের দেড় লক্ষ শিশু হেপাটাইটিস বি ভাইরাসে আক্রান্ত হয় এবং তাদের মধ্যে অন্তত ২৫ হাজার শিশুর মৃত্যু ঘটে।

আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা

হেপাটাইটিস বি রোগের উপসর্গ মৃদু থেকে তীব্র হতে পারে। সাধারণ জন্ডিস (বা হলদিয়া রোগ বা কামেলা) রোগের লক্ষণ থেকে শুরু করে লিভার ক্যান্সারের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তাই জন্ডিসে আক্রান্ত ব্যক্তির উচিত সঠিকভাবে জন্ডিসের কারণ নির্ণয় করা, তথা জীবাণু সনাক্ত করা--বিশেষ রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে যা সহজেই করা যায়। এজন্য এলোপাতাড়ি অবৈজ্ঞানিক (ঝাড়ফুক) পদ্ধতিতে চিকিৎসা না-করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শমত চিকিৎসা করা উচিত। এই ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট যকৃতের প্রদাহ হলে আলফা ইন্টারফেরন এবং লামিডিউডিন নামক দু'টো ঔষধ দেওয়া হয়--যাদের কার্যকারিতা অবস্থাভেদে শতকরা চল্লিশ ভাগ।

প্রতিরোধ

প্রতিরোধই এ-রোগ থেকে বাঁচার প্রধান উপায়। এজন্য হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন নামক একটি টিকা খুবই কার্যকর। সঠিক সময়ে সঠিক নিয়মে টিকা নিলে এর কার্যকারিতা অবস্থাভেদে প্রায় নিরানব্বই ভাগ। এজন্য চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করা উচিত।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে করণীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থাগুলো হচ্ছে:

- নিরাপদ রক্ত সঞ্চালন এবং কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজন
- নিরাপদ যৌনসঙ্গম (যেমন কনডমের ব্যবহার সুনিশ্চিত করা, নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা, সমকামিতা পরিহার করা)
- মাদকাসক্তি থেকে দূরে-থাকা, ইনজেকশনের সূঁচ ভাগাভাগি করে ব্যবহার না-করা
- আক্রান্ত মায়ের সন্তান জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে হেপাটাইটিস বি-এর টিকা দিয়ে দেওয়া
- ঝুকিপূর্ণ ব্যক্তিদের এ-রোগ সম্পর্কে সচেতন করা এবং টিকা দিয়ে দেওয়া।

উপসংহার

হেপাটাইটিস বি একটি মারাত্মক রোগ বটে, তবে সঠিকভাবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে মানবজাতিকে এর ভয়াবহ পরিণাম থেকে বাঁচানো সম্ভব।

স্বাস্থ্য কুইজ ৩৩

১. সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত শিশুর নিউমোনিয়া হচ্ছে কি না তা বুঝার জন্য কী কী লক্ষণ সম্পর্কে খেয়াল রাখতে হবে?

২. খাদ্য-উপাদান কয়টি ও কী কী?

৩. আয়োডিনের অভাবে কী রোগ হয়?

৪. ঝুকিপূর্ণ মাতৃত্ব কী? ঝুকিপূর্ণ মা কাদেরকে বলা যেতে পারে?

৫. শিশুর জন্মের পর থেকে কত মাস বয়স পর্যন্ত শুধু মায়ের বুকের দুধই যথেষ্ট? মায়ের কী কী রোগ থাকলে শিশুকে মায়ের বুকের দুধ দেওয়া যাবে না।

প্রশ্নগুলোর উত্তর আমাদের কাছে ১৫ মার্চ ২০০৩ তারিখের আগেই পৌছাতে হবে

স্বাস্থ্য কুইজ ৩২-এর উত্তর

১. ডেঙ্গু জ্বরের প্রধান তিনটি বিপদ নির্দেশক লক্ষণ হলো:

- শরীরে লাল রঙের চাকা-চাকা দাগ বের-হওয়া
- কালো পায়খানা বা রক্তবমি হওয়া
- অজ্ঞান হয়ে-যাওয়া

২. পৃথিবীর সব দেশেই মহিলাদের মধ্যে মানসিক রোগের হার বেশি। মেয়েলি বিষয়সমূহ, যেমন সন্তান ধারণ ও লালন-পালন, মাসিক শুরু ও বন্ধ হওয়া প্রভৃতি এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণ: যেমন পুরুষশাষিত সমাজ, শুধুই মেয়েদের জন্য নির্ধারিত কাজ, বিভিন্ন সামাজিক বাধ্যবাধকতা ও আরোপিত পারিবারিক মূল্যবোধ (যা শুধু মেয়েদেরই মেনে চলতে হয়) প্রভৃতির জন্যও মেয়েদের মধ্যে মানসিক রোগের হার বেশি।

৩. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-প্রবর্তিত খাবার স্যালাইনে সোডিয়াম ক্লোরাইড ও গ্লুকোজ-এর পরিমাণ কম। প্রচলিত খাবার স্যালাইনে প্রতিলিটারে ৩.৫ গ্রা: সোডিয়াম ক্লোরাইড ও ২০ গ্রা: গ্লুকোজ থাকে, কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রবর্তিত খাবার স্যালাইনে এর পরিমাণ যথাক্রমে ২.৬ গ্রা: এবং ১৩.৫ গ্রা:

৪. শরীরের চামড়া অক্ষত থাকলে সাপের বিষ চামড়ায় লাগালেও কোনো ক্ষতি হয় না।

৫. নিম্নোল্লিখিত ৪টি কারণে শিশুরা এইচআইভি ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে:

- আক্রান্ত মায়ের গর্ভে জন্মের ফলে, আক্রান্ত মায়ের দুধ পান ক'রে
- এইচআইভি ভাইরাসযুক্ত রক্ত শিশুর দেহে পরিসঞ্চালনের মাধ্যমে
- অপরিশোধিত ডাক্তারি যন্ত্রপাতি: যেমন সূঁচ, সিরিঞ্জ ও অপারেশনের সামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে
- আক্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক যৌন-নিপীড়নের মাধ্যমে

সবগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেউ দিতে পারেন নি

সম্ভাব্য এইডস মহামারী নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের সমস্যা ও সুবিধাসমূহ

শাকিল আহমেদ ইবনে মাহমুদ

গত সংখ্যা স্বাস্থ্য সংলাপ-এ প্রকাশিত 'বাংলাদেশে এইডস পরিস্থিতি' শীর্ষক আমার একটি লেখায় উল্লেখ করা হয়েছে: বাংলাদেশে এখনও এইডস রোগটি মহামারী আকারে দেখা না দিলেও আমরা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে আছি, কারণ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, মায়ানমার, নেপাল, ভূটান ও থাইল্যান্ডে এখন এইডস রোগটি মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ বর্তমানে এমন একটি অবস্থানে আছে, যেখানে এইডস নিয়ন্ত্রণে অনেক সমস্যা থাকলেও কিছু কিছু বিষয়ে অনুকূল পরিবেশও বিরাজ করছে। এ-লেখায় সম্ভাব্য এইডস মহামারী নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের সমস্যা ও সুবিধাসমূহ আলোচনা করা হলো:

বাংলাদেশে এইডস প্রতিরোধের সমস্যাসমূহ

১. সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশের দুর্বল অর্থনীতির কারণে সরকারের একার পক্ষে এইচআইভি/এইডস নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নয়।

২. আমাদের পল্লীর জনসাধারণ, এমনকি শহর-অঞ্চলেরও অধিকাংশ লোক বেশ রক্ষণশীল। তাই আমাদের সংস্কৃতি যৌনতা ও যৌনরোগ-সম্পর্কিত মুক্ত আলোচনা সহজে মেনে নেয় না। স্কুল-কলেজে, বিদ্যালয়ে বা পরিবারে যৌনতা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয় না।

৩. বিনোদন মাধ্যমে এবং রেডিও-টেলিভিশনে যৌনতা নিয়ে আলোচনার অনুমতি নেই। যদিও জন্ম নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হিসেবে খাবার বড়ি ও কনডম ব্যবহারের ওপর কিছু বিজ্ঞাপন রেডিও-টেলিভিশনে প্রচারিত হয়, কোনো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এসব বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা হয় না।

৪. স্কুলের পাঠ্যসূচিতে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়টিকে পরোক্ষভাবে যুক্ত করলেও যৌনতা এবং যৌনস্বাস্থ্য বিষয়ে কোনো আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

৫. প্রায় এক লক্ষেরও বেশি পেশাদার যৌনকর্মী নির্দিষ্ট এলাকায় (পতিতালয়ে) অবস্থান করছিলো, কিন্তু এদের একটি বড় অংশকে সেসব অঞ্চল থেকে উচ্ছেদ করার ফলে এরা এখন ভাসমান যৌনকর্মী হিসেবে জনজীবনের সঙ্গে মিশে গেছে।

৬. বাংলাদেশ সরকার এইচআইভি/এইডস বিষয়টিকে আর্থ-সামাজিক সমস্যার চেয়ে চিকিৎসা-সমস্যা হিসেবেই চিহ্নিত করছে।

৭. ব্যাপক এইডস-আক্রান্ত দেশ ভারত দ্বারা আমাদের দেশ পরিবেষ্টিত। প্রতিদিনই বৈধ এবং অবৈধভাবে অনেক লোক সীমান্ত অতিক্রম করছে।

৮. একবিংশ শতাব্দীতে এসেও সচেতন জনগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত আমরা এ-দেশের বহু মানুষের মানসিকতা ও মূল্যবোধের ওপর ততটা অধিকার প্রয়োগ করতে পারছি না। এ-কারণে তারা যৌনতা ও যৌনরোগ সম্পর্কে মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে না।

৯. কাজের নামে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা কিশোরীরা পেটের দায়ে কিংবা দালালের খপ্পরে প'ড়ে অবস্থার শিকার হয়ে যৌনপেশায় নিয়োজিত হচ্ছে। এ-পেশায় আসার আগে তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য কারো কোনো সামাজিক দায়িত্ব পালন করার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

১০. বাসা-বাড়িতে কাজ করতে এসে অনেক কিশোরী মালিকের অথবা মালিকের ছেলে দ্বারা প্ররোচিত হয়ে অবৈধ যৌনসম্পর্ক গড়ে তুলছে; অনেকে জোরপূর্বক ধর্ষিত হচ্ছে; এমন ঘটনা এখন প্রতিনিয়ত খবরের কাগজের শিরোনাম হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত এসব কিশোরী নিজেদের জীবন বিপন্ন ক'রে যৌনপেশায় নিয়োজিত হচ্ছে। অথচ উপরোক্ত কারণগুলোর কোনো প্রতিকার হচ্ছে না।

১১. দেশের উত্তরাঞ্চলের সহজ-সরল কিশোরীদের অভিভাবকদের মধ্যে বাল্যবিবাহ দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কিশোরীদের অশিক্ষিত স্বামীরা অল্প টাকার বিনিময়ে তাদেরকে ঢাকার বিভিন্ন হোটেলে যৌনপেশায় নিয়োজিত করছে।

সম্ভাব্য এইডস মহামারী নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের সুবিধাসমূহ

১. ভৌগলিক দিক থেকে বাংলাদেশ আয়তনে ক্ষুদ্র একটি অঞ্চল, যার রয়েছে প্রায় একটি সমগোত্রীয় জনগোষ্ঠি, যাদের ভাষা ও সংস্কৃতি এক। কেবল ক্ষুদ্র একটি অংশ উর্দুভাষী হলেও তারা বাংলাভাষাও জানে। ভাষা ও সংস্কৃতি এক ধরনের হওয়ার ফলে এইডস নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত একটি সাধারণ প্রচার-কৌশল কাজে লাগালেই সুফল পাওয়ার আশা করা যায়।

২. এইডসসহ যেকোনো স্বাস্থ্যসমস্যা সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগে রয়েছে দক্ষ জনশক্তি ও সুসংগঠিত অবকাঠামো।

৩. মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগ শিক্ষিত। প্রতিটি গ্রামই ঘনবসতিপূর্ণ এবং প্রতি দশজনের ছয় জনই লিখতে-পড়তে পারে। শিক্ষিত মানুষদের কাজে লাগিয়ে নিরক্ষর মানুষদের কাছেও এইডস-সংক্রান্ত প্রচারপত্রের তথ্য পৌছানো সম্ভব।

৪. প্রতিটি গ্রামেই কিছু টেলিভিশন সেট রয়েছে এবং দলবদ্ধভাবে অনেক লোক অনুষ্ঠান দেখে থাকে। প্রায় সারা দেশের লোকই রেডিও শোনে।

৫. স্বাস্থ্য কর্মসূচি যদি সঠিকভাবে উপস্থাপন করা যায় তাহলে তা বাংলাদেশের সহজ-সরল জনগণের দ্বারা সহজেই গৃহীত হয়।

৬. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি বাংলাদেশের একটি সফল অধ্যায়। এর সঙ্গে যৌনশিক্ষা সহজেই অঙ্গীভূত করা যায়, যা পরিণামে এইডসসহ অন্যান্য যৌনরোগ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হবে।

৭. মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেলে পুরুষদের অবাধ যৌনাচার কমে আসবে। অনেক মহিলা এখন পরিবারের জন্য টাকা-পয়সা উপার্জন করার ফলে সেই পটভূমি তৈরি হচ্ছে। এটা এখন শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, দরিদ্র শ্রেণীর গার্মেন্টস-কর্মী পর্যন্ত নিজস্ব উপার্জনের ফলে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জীবন-যাপন করার সুযোগ পাচ্ছে।

এইডস-এর মতো একটি ভয়াবহ এবং জটিল সমস্যার সমাধান সহজ নয়। স্বাস্থ্য শিক্ষা, বিশেষ করে যৌনতাবিষয়ক শিক্ষা ধর্মীয় ও সামাজিক নানা বিধি-নিষেধের কারণে এ-দেশে খুবই নিম্ন-পর্যায়ে আছে। এমন পটভূমিতেও আশার কথা এই যে, এ-দেশের জনসাধারণ একতাবদ্ধ হয়ে অনেক বড় বড় কাজ সমাধা করেছে। তারা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধ করেছে; সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে টিকে আছে। তারা টিকাদান কর্মসূচি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে ব্যাপক সাড়া দিচ্ছে। যথাযথ কৌশল অবলম্বন করে প্রচার চালিয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে পারলে তারা এইচআইভি/এইডস-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেও সফল হবে। অবশ্য আর্থিক সামর্থ্য এই লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি, সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণ এখন আমাদের বেশি প্রয়োজন। সবচেয়ে বড় কথা, বাংলাদেশ সরকার, এনজিও এবং জনসমাজকে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করে সঠিক পথে কাজ করে যেতে হবে।

জলবসন্ত

নন্দিতা নাজমা

প্রকৃতিতে যখন বসন্তের সমারোহ তখন মানুষের শরীরেও জলবসন্তের প্রাদুর্ভাব ঘটে। জলবসন্তের ইংরেজি নাম চিকেন পক্স। জলবসন্ত এক ধরনের ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ। ভেরিসেলা জোস্টার ভাইরাস দ্বারা এ-রোগ হয়ে থাকে। এ-ভাইরাস মানুষের শরীরে সাধারণত তিন ধরনের সংক্রমণ ঘটিয়ে থাকে: যেমন প্রাথমিক, সুপ্ত ও রেকারেন্ট (পুন) সংক্রমণ।

প্রাথমিক সংক্রমণকেই চিকেন পক্স বা ভেরিসেলা বলা হয়। চিকেন পক্স হবার পর ভেরিসেলা জোস্টার ভাইরাস স্নায়ুতন্ত্রের গ্যাঙলিয়াতে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এঅবস্থাকে বলা হয় সুপ্ত সংক্রমণ। কখনও কখনও এই ভাইরাস পুনর্বার সক্রিয় হয়ে সংক্রমণ ঘটায়--তখন তাকে হারপিস জোস্টার বলা হয়।

রোগের বিস্তার

জলবসন্ত রোগটি সমস্ত পৃথিবী জুড়েই বিস্তৃত। ক্রান্তীয় ও উষ্ণমণ্ডলীয় এলাকায় এই রোগ ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। জলবসন্ত যেকোনো বয়সেই হতে পারে। তবে সাধারণত শিশুরাই এ-রোগে বেশি ভুগে থাকে। বড়দের ক্ষেত্রে মারাত্মক আকারে দেখা দেয়। নবজাতক এবং যাদের শরীরে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, তাদের বেলায়ও এ-রোগ মারাত্মক আকারে দেখা দিতে পারে।

কিভাবে ছড়ায়

জলবসন্ত অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি, কাশি বা সংস্পর্শে আসলেই পূর্বে যে ব্যক্তি আক্রান্ত হয় নি তার এ-রোগ হবার সম্ভাবনা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ। শরীরে জলবসন্তের দানা বেরুবার ২/৩ দিন আগে থেকেই এ-রোগ ছড়াতে শুরু করে। দানাগুলো শুকানোর আগ পর্যন্ত এ-রোগ অন্য মানুষের দেহে ছড়াতে থাকে। গুটি বা দানাগুলো শুকানোর সময় রোগ ছড়ায় না।

লক্ষণসমূহ

জলবসন্ত রোগের সুপ্তাবস্থা ১০ থেকে ২১ দিন। দানা বেরুবার ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে যেসব লক্ষণ দেখা যায়, তা হলো জ্বর, গা-ব্যাথা, মাথা-ব্যথা, ক্ষুধামন্দা; কখনো কখনো পেট-ব্যথাও অনুভূত হয়। তাপমাত্রা ১০২° ফারেনহাইট থেকে উচ্চ তাপমাত্রা; যেমন ১০৪° ফারেনহাইট পর্যন্ত উঠতে পারে। জ্বর এবং অন্যান্য লক্ষণগুলো দানা বের হবার পর আরো ২ থেকে ৪ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। জলবসন্তের র‍্যাশ বা দানাগুলো প্রথমে মাথা, মুখ অথবা শরীরে দেখা দেয়। পরে হাতে-পায়ে এবং পুরো শরীরেই বেরুতে থাকে। এছাড়াও, মুখের ভেতরে, খাদ্যনালী, গলনালী, যৌনাঙ্গ, এমনকি

কখনও কখনও চোখের পাতা ও চোখের ভেতরের সাদা অংশেও উঠে থাকে; তবে চোখের কর্ণিয়াতে (কালো অংশে) কখনোই ওঠে না এবং চোখে কখনোই মারাত্মক আকারে ওঠে না।

জলবসন্তের র‍্যাশগুলো প্রথমে লালচে বর্ণের হয় এবং এগুলো খুবই চুলকাতে থাকে। এরপর ছোট ছোট পানির ফোসকার মত স্বচ্ছ হয়। ২৪-৪৮ ঘণ্টা পরে এগুলো একটু ঘোলাটে এবং মাঝখানে গর্তযুক্ত হয়। প্রথম-ওঠা র‍্যাশগুলো যখন শুকাতে শুরু করে তখন দ্বিতীয় ও কয়েক দফায় র‍্যাশ বেরুতে থাকে এবং এ-কারণে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে বিভিন্ন বয়সের গুটি দেখতে পাওয়া যায়। শুকানোর পরে গাঢ় বা হালকা রঙের দাগ কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত থাকতে পারে। সেকেন্ডারি ইনফেকশন হলে অনেক সময় স্থায়ী দাগ সৃষ্টি হয়।

জটিলতা

জলবসন্ত থেকে উদ্ভূত তেমন কোনো জটিলতা সাধারণত দেখা দেয় না। তবে কখনও কখনও নিউমোনিয়া, গিটে-প্রদাহ (আরথ্রাইটিস), হেপাটাইটিস, মস্তিষ্কে প্রদাহ ও নেফ্রাইটিস হতে পারে। এছাড়া, সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণও ঘটতে পারে। জলবসন্তের আরো একটি জটিল অবস্থা হলো রেইজ সিনড্রোম। যেসব শিশুর শরীরে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তাদের ক্ষেত্রে প্রগ্রেসিভ ভেরিসেলা নামে আরো এক ধরনের মারাত্মক জটিলতা দেখা দিতে পারে।

গর্ভাবস্থায় জলবসন্ত

গর্ভাবস্থায় মা জলবসন্তে আক্রান্ত হলে প্রায় ২৫ ভাগ ক্ষেত্রে গর্ভের ভ্রূণ আক্রান্ত হয় এবং এদের মধ্যে ২% শিশু জন্মগত ত্রুটি নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে। গর্ভাবস্থার প্রথম ৮ থেকে ২০ সপ্তাহের মধ্যে মা আক্রান্ত হলে ভ্রূণের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি থাকে। ভ্রূণের হাত, পা, চোখ, মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে।

নবজাতকের জলবসন্ত

যদি বাচ্চা প্রসবের ৭ দিন পূর্বে অথবা বাচ্চা প্রসবের ৭ দিন পরে মা জলবসন্তে আক্রান্ত হয় তাহলে সাধারণত নবজাতকেরও আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা খুবই বেশি থাকে এবং নবজাতকের জলবসন্ত খুবই মারাত্মক আকারে দেখা দেয়।

রোগ নির্ণয়

সাধারণত রোগের লক্ষণ এবং র‍্যাশের বৈশিষ্ট্য থেকেই এ-রোগ সহজেই নির্ণয় করা যায়। কোনো ল্যাবরেটরি পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না।

চিকিৎসা

জলবসন্তের তেমন কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসাই যথেষ্ট। রোগীকে খোলামেলা আলো-বাতাসপূর্ণ ঘরে থাকতে দেওয়া প্রয়োজন। প্রচুর পরিমাণে তরল খাবার এবং পুষ্টিকর খাবার দেওয়া প্রয়োজন। জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল দেওয়া আবশ্যক। মনে রাখা প্রয়োজন: জলবসন্তের চিকিৎসায় কখনোই এসপিরিনজাতীয় ওষুধ দেওয়া যাবে না। এতে করে রেইজ সিনড্রোম নামে একধরনের জটিল রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে। নবজাতক, যাদের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কম এবং যারা জলবসন্তের জটিলতায় ভুগছে তাদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মাত্রায় এন্টিভাইরাল এসাইক্লোভির ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে।

প্রতিরোধ

জলবসন্তের টিকা এখন সর্বত্রই পাওয়া যাচ্ছে। ১২ মাস থেকে ১৮ মাসের শিশুকে এই টিকা ১ ডোজ দিয়ে প্রতিরোধ করা যেতে পারে। ১২ বছরের বেশি বয়সের সকলকে এই টিকার ২টি ডোজ ১ মাসের ব্যবধানে নিতে হবে। যারা কখনো জলবসন্তে আক্রান্ত হয় নি, এই টিকা কেবলমাত্র তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

পরিবারে কেউ আক্রান্ত হলে তাকে অন্যান্য সদস্য থেকে আলাদা করে রেখে সংক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব। আক্রান্ত ব্যক্তির স্পর্শে যদি কোনো গর্ভবতী মহিলা, নবজাতক কিংবা রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কম এমন কোনো ব্যক্তি/শিশু এসে যায়, তবে ভেরিসেলা জোস্টার ইমিউনোগ্লোবিউলিন নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করে রোগ প্রতিরোধ করা যায়। একবার জলবসন্তে আক্রান্ত হবার পর সাধারণত দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে না।